ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1797-1805
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.402

রাণী চন্দের স্মৃতিকথায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ

সায়ন্তন নন্দী, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore is a supreme wonder in the creation of the universe. Can we truly describe him, or fully understand him? In her memoir, Rani Chanda did not attempt to explain that vast greatness. Instead, she relied on the perspectives of learned and wise people to speak about it. What Rani Chanda described was the man who lived beside her, her everyday neighbour, the person who shared her joys and sorrows. He protected her with his affectionate shadow and saved her from the troubles and hardships of the outside world. Like a cluster of tender leaves, Rani grew and swayed in the deep and generous affection of Rabindranath. Rani lost her father at the age of four, but she received the boundless affection of a father from Rabindranath himself. In this essay, four aspects of that personal Rabindranath, drawn from Rani's memoir, have been discussed.

Keywords: Rabindranath Tagore, Rani Chanda, Shantinietan

ভালো শিল্প যখন ক্লিষ্ট জীবনের নির্মোক ভেঙে আত্মকে উপলব্ধি করতে শেখায় তখন আমরা শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীর কাছাকাছি পৌঁছতে চেষ্টা করি, বুঝতে চেষ্টা করি তাঁর জীবনযাপন, খুঁজে পেতে চাই শিল্প উৎসকে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাবধান বানী শোনালেও শিল্পী মন থেকে সম্পূর্ণ শিল্পীমানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করার আগ্রহে আমাদের কোথাও ছেদ পড়েনা। সেকারণেই হয়তো রবীন্দ্রালোচনা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রজীবনের খুঁটিনাটি তথ্য জানবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার সবটাই অকারণ আবেগ নয়। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যিনি শিল্পকে বহু আঙ্গিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনযাপনে ছিল তার প্রভাব। তাই সাহিত্যিক-শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে জেনে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা শেষ হওয়া উচিত নয়। তাঁর শৈল্পিক জীবনরীতি প্রত্যক্ষ ভাবে না জানলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্নদাশংকর রায় যখন তাঁকে 'জীবনশিল্পী' আখ্যা দেন, তার ব্যখ্যায় আমরা কেবল কাব্যের শিল্পরূপই বুঝিনা, সাহিত্যের সমান্তরালে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতির দ্বান্দিকতার মধ্যেও কিভাবে তিনি জীবন ও কর্মের শিল্প মূর্তি রচনা করেছেন তার কথাও বুঝি। দান্তের জীবনকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের প্রাত্যহিক কাজে উভয় ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁর একই প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার অর্থ বিস্তৃততর,

ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। একথা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দৈনন্দিন আলাপচারিতায়, অতিথিবাৎসল্যে, বাসাবদলের আপন খেয়ালে, বিচিত্রগামী বহুমুখী সৃষ্টি কর্ম, পোশাক পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, মননে-চিন্তনে নিজেকে একটু বিকশিত করেছেন তিনি। সেই ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আরো একবার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চারটি দিক উঠে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র খেয়াল: রাণী চন্দ রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে থাকাকালীন বেশ কিছু গুরুদেবের খেয়ালকে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর খেয়াল ছিল হরেকরকম। রাণী চন্দ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোথাও গিয়েছেন, সেখানে সব রকমের সব রঙের পোশাকই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কেবল মেটে সবুজ রঙের জোব্বাটাই হয়তো নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ওই মেটে সবুজ রঙের জোব্বাটারই খোঁজ করবেন। ওটাই যেন তাঁর ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। আবার কখনো এমন দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের টেবিলে গোছা গোছা পেন্সিল তুলি রয়েছে। কেউ হয়তো টেবিল গোছাতে গিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া হলুদ রঙের আড়াই ইঞ্চি পেন্সিলটাই ফেলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক পড়বে সেই পেন্সিলটর উপরেই। রবীন্দ্রনাথের এই বিচিত্র খেয়ালের কথা বলতে গিয়ে রাণী চন্দ এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নানা জায়গা থেকে নানারকমের অনুরোধ আসত-বক্তৃতা দিতে, কোন কিছু উদ্বোধন করতে, রবীন্দ্রনাথ সহজেই রাজি হয়ে যেতেন। পরে হয়তো নিজেরই খেয়াল হতো কিংবা অন্যরা খেয়াল করে দিয়ে বলতেন, 'ও জায়গায় আপনার যাওয়া ঠিক হবে না, তখন তিনি খবর পাঠিয়ে দিতে বলতেন যে তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়।' একবার এক সিগারেট কোম্পানির মালিক এসে রবীন্দ্রনাথকে ধরলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যাক্টরিতে যেতে রজি হন। ভদ্রলোক নানা জায়গা থেকে বন্ধুবান্ধব এনে ঘটা করে আয়োজন করে। সেখানে যাবার আগের দিন রাত্রে সরোজিনী নাইডু খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 'সিগারেট ফ্যাক্টরিতে যাবেন আপনি? এ কখনো হতে পারে না– absurd।' পরেরদিন ভোরে ফ্যাক্টরির মালিক রবীন্দ্রনাথকে নিতে এসে যখন শোনেন, রবীন্দ্রনাথের যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না তখন ভদ্রলোক জানায়, 'আপনার তরফ হতে আর কেউ আসুন। তা না হলে বড়ো অপ্রস্তুত হতে হবে আমাকে। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ রাণী চন্দ এবং অমল চন্দকে পাঠান। রাণী চন্দ লিখেছেন –

> "আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেব। সে এক বিপদ সেদিন। ফ্যাক্টরিতে এলাম। ফ্যাক্টরিতে ঢুকবার আধমাইল আগে হতে পথ ফুলে ফুলে ঢাকা, ফুলের মালায় ছাওয়া। তোরণ ঝালর বাঁশি সানাই; সে যেন এক রাজপুত্রের বিবাহ-আসর। গম্ভীর আপনা হতে হয়ে আছি ব্যাপার দেখে, চেষ্টা আর করতে হয় নি। তোরণের পর তোরণ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন পর্যন্ত ঠিক ছিলাম কিছুই তেমন মনে হয় নি। কিন্তু ফুলের তৈরি প্রকাণ্ড একটা সিংহাসনের উপর উঠিয়ে রাজারানীর মতো আমাদের পাশাপাশি বসিয়ে দিল আর সামনে দাঁড়িয়ে ভাটের দল 'জয় জয় রবীন্দ্র কবীন্দ্র জয়তু' বলে হাত তুলে তুলে সিংহাসন দেখিয়ে গান গাইতে লাগল তখন মনে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বাইরে কোথাও যাবেন দিন ঠিক হয়েছে, কিন্তু কতবার যে তিনি সেই দিন বদলাতেন তার ঠিক থাকতো না। আর বদলাতেনও একেবারে শেষ মুহূর্তে। অমল চন্দ বলতেন,'গুরুদেব ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত বলা যায় না কবে তিনি যাবেন।' আসলে এইসব বিচিত্র খেয়াল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব আমোদ পেতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন –

> "জানিস নে, আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি, বাবু চেঞ্জেস্ হিজ মাইন্ড।"[২]

দিয়ে বলতেন, দ্বারকানাথ তখন বিলেতে, সঙ্গে যারা থাকতেন তাঁরা বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাতেন আজ আমরা অমুক জায়গায় অমুক সময়ে অমুক ডিউকের কাছে যাচ্ছি। অমুক জায়গায় তিন দিন থেকে অমুকদিন ফিরে আসব ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে সব চিঠিরই শেষে লিখতেন –'But one can never be sure – for the Babu changes his mind so often.'

পোশাকে রবীন্দ্র-রুচি: রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের পোশাক নিয়ে বেশ কয়েকটি কথা বলেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের টুপি ছিল নতুন ধরনের। সুতির বা ভেলভেটের বা ঘন রঙের মোটা সিল্কের টুপি পড়তেন রবীন্দ্রনাথ। সে টুপি অন্য কারো টুপির সঙ্গে মেলে না। একেবারে আলাদা। আকারে অনেক বড়ো, নরম। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেকরকম করে তৈরি করার পর এ এ টুপির আবিষ্কার করেছিলেন। মন্দিরে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পড়তেন। বাইরে কোথাও গেলে ব্যবহার করতেন পাজামা বা সিল্কের লুঙ্গি। নয়তো সদাসর্বদা মোটা দু-সুতির লুঙ্গি আর ঢিলে হাতার পাঞ্জাবি পরতেন। কখনো থাকতো তা গেরুয়া রঙের, কখনো থাকতো সাদা ধবধবে। তার উপরে পরতেন লম্বা জোব্বা।।বাইরে বেরোনোর সময় দুটো জোব্বা পড়তেন। ভিতরের জোব্বা বুক-ঢাকা, পুরাতন কুর্তার মতো বুকের উপরে আড়াআড়ি করে কোমরে বোতাম আঁটা। আর উপরেরটি গলা হতে পা পর্যন্ত সামনের দিকে সবটাই খোলা। যেন গায়ে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকত জোব্বাটা। নানা রঙের জোব্বা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কালো, ঘননীল, খয়েরী, বাদামী, কমলা, গেরুয়া, বাসন্তী, মেঘ-ছাই- সিল্কের, সুতোর। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "যখন যেটি পরতেন, মনে হত এইটিই যেন বেশি মানাল তাঁকে। দিনে দিনে মাসে মাসে রঙ বদলে বদলে সাজতে তিনি ভালোবাসতেন। কখনো নতুন সাজে সেজে বসে আছেন -ঘরে ঢুকে দেখে আপনা-আপনি মুখ হতে বেরিয়ে আসত 'বাঃ'। গুরুদেব খুশির হাসি হাসতেন। শীত সবে যাব-যাব করছে, এক বিকেলে দেখি গুরুদেব বাসন্তী রঙের জোব্বা পরে বাইরে বসে আছেন। বেলাশেষের আলো পড়ে সে রঙ যেন জ্বলে উঠল। বিস্ময় উচ্ছ্বাস দুই মিলিয়ে দেখি, দেখে হাসি, বলি, এই সময়ে এই সাজে যে? গুরুদেবও হাসেন, বললেন, বসন্তের আসার সময় হলো যে। আমি যদি তাকে ডেকে না আনি কে আনবে বল? তাই তো বাসন্তী রঙে সেজে বসন্তকে আহ্বান করছি।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের খাওয়া-দাওয়া: রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কখনো তিনি হাতে খেতে দেখেননি। তিনি খেতেন কাঁটাচামচ এ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মিতহারী। সব মিলিয়ে দু-তিন চামচ পরিমাণ খাবার খেতেন। তাই বলে তাঁকে কম করে খাবার দেওয়া চলতো না, অসন্তুষ্ট হতেন। থালায় বাটিতে নানারকমের খাবার সাজিয়ে তাঁর সামনে ধরা হলে তিনি বাটিগুলির ঢাকা খুলে খুলে আগে দেখতেন কি কি আছে। তারপর যে মাংস ভালোবাসে তাঁর বাড়িতে মাংস পাঠিয়ে দিতেন, যে মাছ ভালোবাসে তাঁর বাড়িতে মাছের বাটিটা পাঠাতেন, এইভাবে কারুর জন্য চপ, কারুর জন্য পায়েস, কারুর জন্য বড়ির ঝোল, এইকরে প্রায় সবটাই বিলি করে দিতেন। কাছে কেউ থাকলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেখানে বসিয়েই খাওয়াতেন। রাণী চন্দ বলেছেন –'খাওয়াতে খাওয়া দেখতে গুরুদেব খুব ভালোবাসতেন।' রবীন্দ্রনাথ সকালে খেতেন চা পাউরুটি এবং টোস্ট। কোনদিন বা একটা আধসেদ্ধ ডিম। আমের দিনে আম খেতেন, রবীন্দ্রনাথ আম খেতে খুব ভালোবাসতেন। দুপিঠ কেটে চামচ দিয়ে তুলে নিতেন মাঝখানটা। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "গুরুদেবের চা খাওয়াটা ছিল বড়ো মজার। চা নামেই থাকত শুধু। কেটলিভরা গরম জলে কয়েকটা চা পাতা ফেলে দিতেন, জলে রঙ ধরত কি না ধরত তারই আধপেয়ালা ঢেলে নিয়ে বাকিটা দুধ দিয়ে ভর্তি করে নিতেন, দু চামচ চিনি দিতেন; এই হল তাঁর চা। চা-এর জন্যই যে চা খেতেন, তা নয়। গরম পানীয় একটা খেতে হবে তাই নামেমাত্র চা খেতেন। 'চীনে চা'ই পছন্দ করতেন তিনি।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ বেলা নটা নাগাদ খেতেন এক পেয়ালা স্যানাটোজন কিংবা হরলিক্স কিংবা ঐ জাতীয় কিছু পানীয় বস্তু। স্নানে যেতেন বেলা দশটা সাড়ে-দশটায়। এগারোটা সাড়ে-এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতেন। রাণী চন্দ বলেছেন – 'দুপুরে দিশি ধরনের রান্না হত, শ্বেতপাথরের থালা বাটিতে খাবার সাজিয়ে আনা হয়। খাবার শেষে এ বেলায় একটু দই রোজই খেতেন।' বিকেলে রবীন্দ্রনাথ চা সঙ্গে নোন্তা মিষ্টি যা থাকত একটু মুখে দিতেন। কখনো কখনো কিছুই খেতেন না চা ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসে লিখতেন সেখানেই লেখার টেবিল সরিয়ে অন্য টেবিল লাগিয়ে বনমালী খাবার এনে দিত। কখনো কখনো রাত্রে উদয়নে গিয়ে খেতেন। পায়ে চলার এই একমাত্র সময় ও স্থান।কোনার্ক, উদীচী, পুনশ্চ, শ্যামলী – যেখানে থকতেন সেখান হতে সন্ধ্যের দিকে উদয়নে যেতেন। বিশেষ অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁদের নিয়ে উদয়নে খাবার ঘরে টেবিলে বসেও খেতেন। সন্ধ্যেরাত্রেই খেতেন তিনি। খাবার সম্বন্ধে কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের কোন কালেই ছিল না। তবে 'চই'সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> "যশোরে হত; কচি বাঁশের গুঁড়ি নাকি, আমি কখনো দেখি নি হতে, গুরুদেবের কাছেই প্রথমে এর নাম শুনি, তিনি গেয়েছেন বহুবার। একবার একজন এনে দিলেন, ডাল দিয়ে রান্না হল, গুরুদেব আমাদেরও খেতে দিলেন; ডাঁটার মতো খেতে খানিকটা। খুব বেশি স্বাদ-স্বোয়াদ পেলাম না। গুরুদেব কিন্তু বেশ আগ্রহ নিয়েই খেলেন। চই নিয়ে গুরুদেবের আগ্রহ দেখে বোঠান আড়ালে হাসতেন, বলতেন, বাবামশায়ের শ্বশুরের দেশের জিনিস কিনা তাই তাঁর এত ভালো লাগে।"[৫]

বাড়ির মতো খাবার নিয়েও ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র খেয়াল। কোন খাবারই একটানা বেশিদিন খেতেন না। একদিন এক পণ্ডিত অতিথি আসেন। কথায় কথায় বলেন, 'আমাদের দেশে হবিষ্যান্নই একমাত্র উপযুক্ত আহার, শাস্ত্রে পুরাণেও সেই কথাই বলে;' এই বলে কতকগুলি আখ্যান ও উপমার উল্লেখ করলেন লোকটি। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলি। লোকটি চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন-

> "ইনি যা বলে গেলেন ঠিক কথাই, আমাদের দেশ গরম দেশ। এ দেশে দেহ মন ঠিক রাখতে হবিষ্যান্নই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। কাল থেকে আমাকে তাই দিও বউমা। আমি কিছুকাল থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যা খাচ্ছি তার আমার দেহ ঠিকমত নিতে পারছে না। অথচ বুঝতে পারছিলাম না কি করা যেতে পারে। এবারে ঠিক আচার্য বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের কথামতো তখনি লোক ছুটল হাটে, কুমোরের ঘর থেকে সদ্য পোড়া লালমাটির এক ঝুড়ি মালসা নিয়ে আসে। এবেলা ওবেলা নতুন নতুন মালসায় কর্মচারীরা রবীন্দ্রনাথকে হবিষ্যান্ন রান্না করে দেন। রবীন্দ্রনাথও খেয়ে খুব খুশি। বললেন,'মাছ মাংস সাত-পাঁচ জিনিস, এতে করে পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া হয়, অপকারই ঘটে শরীরের। এই খাবার খেয়ে বেশ বুঝতে পারছি, কাল হতে খুব ভালো বোধ করছি

আমি।' এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক বিদেশী বন্ধু আসে। তিনি বললেন 'ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য ডিমে সব রকমেরই খাদ্যগুণ আছে।' যেই কথা তেমনি কাজ। পরদিন রান্নাঘরে চাল কাঁচকলার জায়গায় ডিম আসে। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন এবং একটু নুন গোলমরিচ দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেয়। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে। এতেই যেন রবীন্দ্রনাথ ভালো বোধ করেন। বলেন,'এই খাবারই চলবে আমার এখন থেকে।' এইভাবে কিছুদিন যেতে না যেতে আশ্রমে আর এক অতিথি আসেন। এই অতিথির আবার আয়ুর্বেদ এ ছিল বিশেষ অধিকার। তিনি বলেন, নিমপাতার রস হলো সর্বরোগনাশক। এই রস রোজ কিছুটা খেলে শরীর একেবারে সুস্থ থাকে। রবীন্দ্রনাথও শুরু করে দিলেন নিমপাতার রস খেতে। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "সে কি একটু আধটু? বড়ো একটা কাঁচের গ্লাসভর্তি রস, সবুজ রঙের থকথকে রস দেখে আর নিমপাতার তেতো গন্ধে আমাদের গা গুলিয়ে উঠত। গুরুদেব তা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেন, যেন পেস্তাবাটা শরবত খাচ্ছেন। বলেন, জানিস- কি ভালো জিনিস এটা। এ খেয়ে অবধি আমি এত ভালো বোধ করছি, এমনটি কখনো করি নি। বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়; বেশি কেন-ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।"[৭]

একদিন সেবাগ্রাম থেকে একজন লোক আসে। তিনি বললেন যে, রসুন খুবই উপকারী -বিশেষ করে বৃদ্ধলোকের পক্ষে। এতে হাত-পায়ের বেদনা ইত্যাদি যায়, এবং আরো বহুরকম উপকার হয়। রবীন্দ্রনাথও যেন প্রতিদিন রসুন খায়। রবীন্দ্রনাথও দুবেলা করে বাটা রসুনের ডেলা বড়ি খেতে শুরু করেন। আবার এক বিদেশী ডাক্তার এসে জানায়, আগুনে সিদ্ধ করা রান্না তরকারিই আমাদের যত সর্বনাশের মূল। আগুনের তাপ লাগা মাত্র খাদ্যের সমস্ত পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সব কিছু কাঁচা খাওয়া উচিত। পরদিন সকাল থেকে আগের সমস্ত ব্যবস্থা পাল্টে যায়। রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন-

> "তাই তো এরা আমায় কেবল যা-তা খাওয়াচ্ছে এতদিন ধরে। আজেবাজে সতেরো রকমের তরকারি-এ রাঁধতে বাড়তেও তো কম ঝঞ্ঝাট নয়। অথচ কি উপকার এতে! তার চেয়ে কাঁচা সবজি কেটে কুচিয়ে খাও, একটু নুন দাও, লেবুর রস দাও -ব্যস্! খেতেও সুস্বাদু, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। এখন থেকে আমি এটাই খাব।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে দিলেন, কি কি সবজি চাই; সেই সব কুচোনো সবজি আশ্রমের রান্নাঘরে নিয়ে আসা হয়। মায় আলু পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ সব সবজি একটা বড়ো বাটিতে নিয়ে নুন লেবুর রস মিশিয়ে নিজে খেলেন খানিকটা, বাকিটা বাটিতে বাটিতে বেঁটে দিলেন স্নেহভাজনদের। সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যত ইচ্ছে খাও- পেটও ভরবে, আলাদা একটা শক্তিও অনুভব করবে।' কিন্তু এভাবে সবকিছু ঠিকঠাক এগোলেও সবচেয়ে মুশকিল হয় যখন এক গুজরাটি অতিথি এসে বলেন, ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দিয়ে পরোটা বানিয়ে খেলে জীবনে আর ডাক্তার ডাকতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের খাবার সময়ে যারা ধারে কাছে থাকেন একথা শোনার পর সেদিন তাদেরও মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ক্যাস্টর অয়েলের পরোটা খেয়ে খুব খুশি। বললেন,'এই এতদিনে ঠিকটি হল-যেমনটি নাকি আমি চাইছিলুম।'

অতিথি আপ্যায়ন এবং সকলের আশ্রয় যখন রবীন্দ্রনাথ: বিচিত্র রকমের অতিথি আসতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> "পাগল-পাগলই আসত কত রকমের। এত রকমের যে পাগল আছে সংসারে গুরুদেবের কাছাকাছি থেকে না জানলে তা ভাবতেই পারতাম না কখনো। Overজিনিয়াস, ছিটগ্রস্ত, উন্মাদ, বদ্ধ-উন্মাদ, অর্ধ-উন্মাদ মতলবের উন্মাদ, সাজা-উন্মাদ-সে কত রকমের। কাউকে তিনি কাছে আসতে বাধা দিতেন না। সকাল হতে একদিকে চলত গুরুদেবের লেখার কাজ, আর এক দিকে বইত লোকজনের অনবরত আসা-যাওয়ার স্রোত। বিরাম ছিল না এর। অবারিত দ্বার, কেউ দেখা করতে এসে ফিরে গেছে, শুনি নি কখনো। আশ্রমেরও ছোটোবড়ো সকলে কাজে অকাজে দিনে কত কত বার আসছে যাচ্ছে, কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি তাতে। দূরদূরান্ত দেশদেশান্ত হতেও কতশত জন আসতেন। সময় নেই, অসময় নেই হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছেন, ভালো বেসেছেন। তাঁরা আসতে তিনি হাতের কলম ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করেছেন, চলে গেলে পর আবার লিখেছেন। এমনি ভাবেই লেখা চলত সারাদিন। দুপুরে বিশ্রাম নিতেও রাজি থাকতেন না। এক এক সময়ে ভেবে অবাক হতাম, এখনো হই যে, কি করে একজন মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এণনতরো একটানা একটা পিঠ-সোজা চেয়ারে বসে লিখে যেতে পারেন।"[৯]

রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, একবার এক পাগল এল, কিছুতেই সে আর রবীন্দ্রনাথকে ছাড়ে না অথচ কি যে তার বলবার কথা সে জানে না। রবীন্দ্রনাথ যতবারই লেখায় মন দিতে চান ততবারই বাধা পান। এদিকে রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা লেখার জন্য তিনি ব্যাকুল। বারবার বাধা পড়ায় রবীন্দ্রনাথের মুখের সে ভাব আরো করুণ হয়ে উঠেছে। সেইদিন সন্ধেবেলা রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বললেন, 'সবারই সময়-অসময় আছে, নেই কেবল আমারই। আমার নিজের বলে দিনের একটুখানি সময়ও আমি পাই নে কখনো।'পরেরদিন থেকে সেক্রেটারি অমল চন্দ তাঁর অলক্ষ্যে নিয়ম বাঁধলেন, যখন-তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া চলবে না কারো। আশ্রমের লোকের কথা আলাদা, তবে বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য সময় স্থির করা থাকলো ঘড়ির এতটা থেকে এতটা। দুদিন বেশ লোক আটকানো গেলেও তিন দিনের দিন একটি লোককে বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কিছু-একটা হয়েছে যাতে করে এদের সহজ আসার পথ বন্ধ। সেক্রেটারিকে ডেকে তিনি বললেন-

> "তোরা কি ভাবিস আমি একটা কেউ-কেটা, নবাব-বাদশা? আমার কাছে আসতে হলে সেপাই-সান্ত্রী পেরিয়ে তবে আসতে হবে? আহা, বেচারারা- দূর দূর হতে আসে, কি, না- আমায় একটু দেখে যাবে, কি, প্রণাম করবে- নাহয় দুটো কথাই বলবে। তার জন্য এত কি কড়াকড়ি? দোর আমার খোলা থাকবে, যার যখন মন চায় আসবে আমার কাছে, কাউকে বাধা দিস নে যেন তোরা আর কখনো।"[১০]

সেক্রেটারি ইতস্তত করেন। বলেন, 'আপনার লেখার সময়ে বিরক্ত করলে আপনার অসুবিধে হতে পারে!' রবীন্দ্রনাথ তখন জানান, 'তা হয় হোক, তবু কেউ এসে দূরে বসে অপেক্ষা করবে এ ভারি অন্যায়।' রোজ সকালে পোস্ট অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য যে ডাক আসত তা ছিল দেখার মতো। সে এক বোঝা। দৈনিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, সংবাদপত্রেরই এক স্তূপ। কত বিচিত্র নাম সে-সবের। এত কাগজও দেশবিদেশের আনাচকানাচ হতে বের হয় রোজ, না দেখলে যেন কারুর বিশ্বাস হয় না। ডাক নিয়ে এলেই রাণী চন্দ সহ আশ্রমের বালিকারা পিছনে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাংলা সংবাদপত্র আর গল্প-উপন্যাসের বইগুলির উপরই ছিল রাণী চন্দের নজর। চিঠিগুলি নিজের হাতেই

রবীন্দ্রনাথ ছিঁড়তেন। রাণী চন্দ বলেছেন, নানা ধরনের পাগলের চিঠিও থাকতো। অনেককে আবার রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে চিঠিও লিখতেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ চেয়ে পাঠিয়েছেন। কেউ ছাপিয়েছেন কবিতার বই, অনুরোধ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যেন বিলেতে লিখে তাঁকে এই বছরের নোবেল প্রাইজটা পাইয়ে দেন। কেউ লিখেছেন তাঁর অনূঢ়া কন্যার জন্য সুপাত্র দেখে দিতে; কেউ-বা নিজেই পাত্রী চোখে বসেছেন, প্রথমা স্ত্রীকে আর সহ্য করতে পারছেন না, কেউ চেয়েছেন দেড় লক্ষ টাকা, যেন রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ এই টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করেন, এই টাকা পেলে তবেই ভদ্রলোক সংসারের ভার হতে মুক্ত হয়ে সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকতে পারবেন বাকি জীবন-ভর, নয়তো তাঁর প্রতিভার অপমৃত্যুতে যে মহা ক্ষতি সাধিত হবে সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেই জবাবদিহি করতে হবে সারা পৃথিবীর কাছে। এরকম রোজ কত কত চিঠি আসতো রবীন্দ্রনাথের কাছে। শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আসত আশীর্বাদী কয়েক লাইন কবিতার চাহিদা। আসত রঙে পেন্সিলে কাঁচা-পাকা হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, আবদার থাকত নাম সই করে ফেরত পাঠিয়ে দেবার। লেখা বা কবিতা সংশোধন করে দিতে হবে এমন চিঠিও আসত অগুনতি। প্রশংসাপত্র লিখে পাঠানোর অনুরোধও অজস্র। ভালো চিঠি- যা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতেন, তা খুব কমই থাকত। চিঠিগুলি দেখে, পড়ে ভাগাভাগি করে ফেলতেন। কতকগুলি টেবিলের উপরে রাখতেন, উত্তর দেবেন। কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলতেন, উপভোগ্য পাগলামির চিঠিগুলি সেক্রেটারি অনিল চন্দের হাতে তুলে দিতেন- 'বলতেন, নাও, সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে দিলুম তোমাকে।'এ-সব ছাড়া আসত নানা দেশের নবীন প্রবীণ নানা লেখকের নতুন ছাপা বই রোজ একগাদা। বই ম্যাগাজিন সবগুলিই রবীন্দ্রনাথ একবার করে হাতে নিয়ে উল্টে দেখতেন। ওতেই তাঁর পড়া হয়ে যেত বেশির ভাগ বইগুলিই। এ এক দেখবার মতো ছিল। বই একটি হাতে তুলে নিতেন, নিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠতে চেপে এক-এক করে পৃষ্ঠাগুলি ছেড়ে দিতেন, এক সেকেণ্ড কি দু সেকেণ্ড এক-এক পৃষ্ঠায় নজর পড়ত, তারই মধ্যে বলে বলে যেতেন, এই হল-তাই হল, সেই তো বড়ো দুর্ভোগ তো তার, আহা মেয়েটা মরেই গেল, ছেলেটা সন্নেসী হয়ে বেরিয়ে গেল, হল- হয়ে গেল- নাও, বলে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন। রাণী চন্দও সঙ্গে সঙ্গে বইটি নিয়ে নিতেন। রাণী চন্দ বলেছেন, এমন করেই কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকখানা বইই রবীন্দ্রনাথের পড়া হয়ে যেত। শুধু পড়া নয়, সে-সবের ভালোমন্দ সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ করে যেতেন। সময়মত ভালো করে পড়ে দেখবেন যে-সব বই সেগুলি কাছে রেখে দিতেন। অন্য বইগুলি দু হাতে বুকের উপরে জড়ো করে রাণী চন্দ ঘরে চলে আসতেন। রাণী চন্দ বলেছেন, নিত্য এ ছিল এক নেশার মতো যেন তার। অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কারো চিঠির উল্টো পাতায় ছেঁড়া খামে টুকরো টুকরো কবিতা লিখতেন, লিখে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে রাখা ওয়েস্ট পেপারের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। বনমালী সাফ করত ঝুড়ি, বাইরে সব ঝেড়ে ফেলে দিত। তখন রাণী চন্দ সহ কারুরই খেয়াল হয়নি যে সে-সব টুকরো কাগজ কুড়িয়ে রাখি। সহজ কথাবার্তার মধ্যে সহজ রহস্যের ছলেও দু-চার লাইনের কত কবিতা লিখতেন, লিখে ফেলে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। রাণী চন্দের স্মৃতিকথায় রয়েছে, একবার কোনো-এক কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল। কন্যাটি একটু চপলা স্বভাবের ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের উল্টো পাতায় লিখলেন-

"অবিয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দূরে রবে পড়ি,
অন্য সব বন্যমৃগী যত ছিঁড়ে দড়াদড়ি
যখন করিবে সঞ্চরণ,
মন তব উঠিবে সন্তাপি।

মায়াবনে যে করে মৃগয়া,
নাই তার দয়া।"[১১]

লিখেই ছিঁড়ে ফেললেন, বললেন, 'দেখিস, এ যেন বাইরে না যায়।' রাণী বলেছেন তেমনি আর-এক দিনের বিপরীত এক ঘটনা- আঘাত পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কারো অকৃতজ্ঞতায়। হাত তখনো কাঁপছে, চিঠি লিখলেন তাকে। এমনতরো কাঁপুনি হাতের লেখা রাণী আর কখনো দেখেননি। সেক্রেটারিকে তখনই সে চিঠি ডাকে ফেলতে দিলেন। উনি দেখেন আর ভাবেন এ চিঠি ডাকে দেবেন কি দেবেন না। খানিকপরেই রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'চিঠিটা ডাকে দিয়েছিস? দিস নি? ভালোই করেছিস। ছিড়ে ফেলে দে।'অসংখ্য অটোগ্রাফখাতা আসত রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিদিন। শুধু নাম-সইয়ে চলবে না, কবিতাও চাই। কয়েক ঝুড়ি কবিতা হবে সব একসঙ্গে করলে। একবার কে একজন এসে বললে, গান্ধীজী তাঁর প্রতিটি নাম-সইয়ে পাঁচ টাকা করে নেন, হরিজন ভাণ্ডারের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এতো মন্দ কথা নয়। রোজ কত কত অটোগ্রাফ-খাতায় লিখি, এবার হতে আমিও এক টাকা করে নেব দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য।' সচ্চিদানন্দ রায় রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার নিয়ে আছেন কিছুদিন থেকে। রবীন্দ্রনাথ সচ্চিদানন্দ রায়ের উপরে ভার দিলেন এই কাজের, মানে, হিসেবমাফিক টাকা তুলবার। ছেলেরা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে আসে, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন- সচ্চিদানন্দ রায়েরা গিয়ে সামনে দাঁড়ান। লেখা হয়ে গেলেই টাকাটা চাইবেন। গুরুদেব ধমকে ওঠেন, 'এরা এখানকার ছেলে, এদের কাছ হতে টাকা নিবি কি।'রাণী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বাইরের কেউ অটোগ্রাফ নিতে এলে, পাছে সচ্চিদানন্দ রায় টাকা চেয়ে বসেন, আগে হতে সচ্চিদানন্দকে রবীন্দ্রনাথ চোখের ইশারায় মানা করে দেন। ছাত্রীরা কেউ এলে তাদের নিজেই সাবধান করে দেন, 'আলু' টাকা চাইলে যেন দিস নে তোরা। দৌড়ে পালিয়ে যাস। এদিকে একদিন সচ্চিদানন্দ বলেন, 'তবে নিয়ম করলেন কেন?'রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'নিয়ম করলেই কি সব মান তোমরা? যাও, নিজের কাজে যাও।' রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন –

> "এই আমারই হাত দিয়ে কত অটোগ্রাফ-খাতা এসেছে গেছে- কত লোকের। সে-সব কবিতা এমনিই চলে গেল। লিখে রাখি নি কখনো। কত কত কাজের জন্য কত অনুতাপ জাগে মনে ক্ষণে ক্ষণে। একজন গুরুদেবের কিছু কথা চেয়ে অটোগ্রাফ-খাতা পাঠিয়েছেন। গুরুদেব কেমন একটু উন্মনা ছিলেন, সেদিন খাতাটি সামনে এনে ধরতে বলে উঠলেন, কি হবে রে কথা দিয়ে? কেবল কথা, কথা, কথা। বলে খাতাটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –
>
> বাজে কথার ঝুলি
> যতই কেন ভর্তি কর
> ধূলিতে হবে ধূলি
>
> ভাবলাম, তাই বুঝি বা। ধূলিই হয়ে যাবে সব। বুঝতে পারি নি তখন যে, কোন কথা ধূলি হয়- আর কোনটা হয় না।"[১২]

তথ্যসূত্র:

১। চন্দ, রাণী। 'গুরুদেব'। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৬৯, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৬, পৃ. ৫৬।
২। তদেব। পৃ. ২৬।

৩। তদেব। পৃ. ৪৭।
৪। তদেব। পৃ. ১০৬।
৫। তদেব। পৃ. ১০৬-১০৭।
৬। তদেব। পৃ. ১০৮।
৭। তদেব। পৃ. ১০৯।
৮। তদেব। পৃ. ১০৯।
৯। তদেব। পৃ. ৬৬।
১০। তদেব। পৃ. ৬৭।
১১। তদেব। পৃ. ৬৯।
১২। তদেব। পৃ. ৭১।